প্রিয়বাংলা-এর মুখোমুখি

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাক্ষাতকার গ্রহণ ঃ লোপা দাস চৌধুরী

অনুলিখন ঃ রেজোয়ানা শামস নওরিন

বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি সৃজনশীল নাম। তিনিই কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, যাঁর হাত ধরে আধুনিক বাংলা কবিতা পেয়েছে পরিপক্কতা। কবিতার পাশাপাশি উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী রচনায় সমানভাবে পারদর্শী তিনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই সময় প্রথম প্রকাশনার এক দশক পরও পাঠকের মনোযোগ এখনো ধরে রেখেছে। তাঁর লেখা বহু উপন্যাস চলচ্চিত্রিক রূপ পেয়েছে। আবেগী ও তেজস্বী অভিব্যক্তি আর অসাধারণ রচনাশৈলী তাঁকে এনে দিয়েছে অগণিত পুরস্কার আর সর্বস্তরের বাঙালির ভালবাসা। বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৮৩), সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৫), দু'বার আনন্দ পুরস্কার এবং সম্প্রতি সরস্বতী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ***The Library of Congress***-এর সংগ্রহে তাঁর লিখিত একশ আশিটি রচনা (অনুবাদসহ) আছে। সম্প্রতি প্রিয়বাংলা-এর সুযোগ হয় তাঁর মুখোমুখি হবার। *প্রিয়বাংলা*-এর পক্ষ থেকে লোপাদাস চৌধুরী তার সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এখানে তাঁদের সেই কথোপকথন ছাপা হলো।

প্রিয়বাংলা ঃ আপনার জন্ম তো বাংলাদেশের ফরিদপুরে। ওখানেই কি আপনার পৈত্রিক বাড়ি?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ফরিদপুর জেলার আইচপাড়া নামের ছোট্ট একটা গ্রামে আমার পৈত্রিক বাড়ি। তবে আমার জন্ম হয়েছিল মামাবাড়িতে। ওটাও ওখানে, আমগ্রামে।

প্রিবাং. ঃ আপনার শৈশব কি তাহলে ওখানেই মানে ফরিদপুরে কেটেছে?

সু.গ. ঃ না, তা নয়। দেশের বাড়ি (ফরিদপুরে) কখনোই আমাদের একটানা থাকা হয় নি। আমার বাবা দেশভাগের অনেক আগে কোলকাতা লেখাপড়া করতে গিয়েছিলেন। লেখাপড়া শেষে ওখানেই স্কুলে চাকরি পান। আমরা কোলকাতাতে স্থায়ী হয়ে যাই। আমি ছাড়া আমার সব ভাইবোনদের জন্ম কোলকাতায়। আমরা ফরিদপুরে মাঝেমধ্যে এসে থাকতাম, বছরে দু'বার স্কুল ছুটির সময়গুলোতে। দেশভাগের বহু আগে থেকেই আমরা কোলকাতার অধিবাসি।

প্রিবাং. ঃ ছোটবেলায় বেড়াতে যাবার সুবাদেই কি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে আপনার পরিচয়?

সু.গ. ঃ তা তো বটেই। প্রতি বছর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেও এক বছর আমরা দেশের বাড়িতে একটানা ছিলাম। সেটা হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোলকাতায় যখন বোমা ফুটছিল। তখন কোলকাতা থেকে বহু লোক পালিয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় আমার বাবার স্কুল। তিনি আমাদের দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে রয়ে গেলেন কোলকাতায়। তখন আমরা একবছর ওখানে ছিলাম, আমি গ্রামের একটা স্কুলে ভর্তিও হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স হবে দশ/ বারো বছর। আমার দেশের বাড়ির বেশির ভাগ স্মৃতি ঐ সময়টারই।

প্রিবাং. ঃ আপনি তো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেছেন। লেখক সুনীল অর্থনীতিতে মাস্টার্স- কেন?

সু.গ. ঃ আমি কিন্তু বি.এ. পাশ করার পর আর পড়াশুনা করতে চাই নি। পরিবারের অবস্থা খারাপ ছিল বলে চাকরি করতে চেয়েছিলাম। পরে বন্ধুবান্ধবদের সাথে এম.এ. পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম শুধু ডিগ্রিটার জন্য। ওটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া লেখালেখিতে তো আমি আরও পরে আসি। তখন তো জানতাম না লেখালেখিই আমার পেশা হবে।

প্রিবাং. ঃ আপনার সাহিত্য চর্চার শুরুটা তাহলে কিভাবে?

সু.গ. ঃ টুকটাক কবিতা লিখতাম। একটা পত্রিকাও বের করি, *কৃত্তিবাস*। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করে কাটাতাম। চাকরিও করতাম। পরে একটা সুযোগ আসে ১৯৬৩ সালে। তখন আমেরিকার আয়ওয়া ইউনিভার্সিটিতে দেশ বিদেশের তরুণ লেখকদের নিয়ে রাইটার্স ওয়ার্কশপ হতো। ওদের পরিচালক পল এঙ্গেল ভারতবর্ষ ঘুরতে ঘুরতে কোলকাতা এসেছিলেন। অনেকের মধ্যে আমার সাথেও তাঁর পরিচয় হয়। যে কারণেই হোক উনি আমাকে পছন্দ করেন এবং আমাকে আয়ওয়ার সেই ওয়ার্কশপে আমন্ত্রণ জানান। আমার চিরকালই ভ্রমণে উৎসাহ ছিল। আর বিদেশ দেখব– এটাতো স্বপ্নের মতো ছিল। তো ঐ আমন্ত্রণটা আমি লুফে নিলাম। চাকরি-বাকরি ছেড়ে স্বপ্ন মুঠো করে চলে এলাম এদেশে। একবছর থাকার পর পল এঙ্গেল আমাকে ওখানেই চিরস্থায়ীভাবে থাকতে বললেন। বললেন, তোমার দেশে চাকরি নেই, তারচে বরং বিদেশে থেকে যাও আর দেশে টাকা পাঠাও। বেশ বাস্তবমুখি উপদেশ। কিন্তু ওই সময়ই আমি সিদ্ধান্ত নেই আমি জীবনে কি করব। চাকরি করব নাকি লেখালেখি করব। চাকরি তো সব লোকই করে। কিন্তু আমার ভাল লাগে লেখালেখি করতে। যদি লিখতেই হয় এবং বাংলাতেই লিখতে হয়– তাহলে আমাকে ফিরে যেতে হবে বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের মধ্যে। বিদেশে বসে অন্য ভাষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সফল

হয় না। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দেশে ফিরে যাব আর লেখালেখি করব। এভাবেই শুরু।

প্রিবাং. ঃ এতে তো অনেক ঝুঁকি ছিল। দেশে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তার উপর কাঁধে পরিবারের দায়িত্ব ছিল। এরপরও আমেরিকা ছেড়ে দেশে ফিরে এলেন। একজন তরুণ লেখক হিসাবে কতটা সংগ্রাম করতে হয়েছে আপনাকে?
সু.গ. ঃ দেশে আসার পর তো আমি হয়ে গেলাম এক স্ট্রাগলিং রাইটার। আমাদের দেশে উপার্জন করতে গেলে লিখে তো আর বেশি উপার্জন করা যায় না। বিশেষ করে বাংলা লিখে। তাই প্রচুর লিখতে হতো আমাকে। Freelance লেখক হিসেবে নানা রকম জিনিস লিখতে লাগলাম। তখনই গদ্য লিখতে শুরু করি। আর ঐ সময়ই আমার মাথায় একটা ধারণা ঢুকেছিল। আমার একজন বন্ধু ছিলেন, খুব বড় কবি– এলেন গিন্সবার্গ; উনারা তখন *বিট জেনারেশন* নামে সাহিত্য আন্দোলন করছিলেন। উনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে ছিলেন যে লেখাটাই চব্বিশ ঘণ্টার কাজ। লিখতে চাইলে চাকরি বাকরি করা যাবে না। আমিও তখন ভাবলাম, দেখি চেষ্টা করে। এভাবে লিখতে লিখতেই লেখালেখি শুরু হলো।

প্রিবাং. ঃ আপনি তো শুরুর দিকে বেশ কতগুলো ছদ্মনামে লিখতেন নীললোহিত, সনাতন পাঠক ইত্যাদি। ছদ্মনাম নেবার কারণ কি?
সু.গ. ঃ ঐ যে বললাম, বিদেশ থেকে ফিরে অনেক লিখতে হতো। তো এখনও আমি নীললোহিত নামে লিখি মাঝে মাঝে। এটা আমার সবচে প্রিয় ছদ্মনাম। অন্যগুলো নিয়ে আর লিখি না।

প্রিবাং. ঃ সত্যজিৎ রায় আপনার লেখা অর্জুন, প্রতিদ্বন্দী, অরণ্যের দিনরাত্রি- উপন্যাসগুলো নিয়ে চলচ্চিত্র বানিয়েছেন। এটা আপনার সাহিত্য জীবনে কি রকম প্রভাব রেখেছে?
সু. গ. ঃ আমার লেখালেখি তো কবিতা দিয়ে শুরু। পরে গল্প, উপন্যাস লেখা শুরু করি। সত্যজিৎ রায় *অরণ্যের দিনরাত্রি* থেকে সিনেমা বানালে আমি কবি থেকে গদ্য লেখক হিসেবে পরিচিতি পাই। তিনি সিনেমা বানানোর পর সবাই কৌতূহলী হয়েছিল- এত বিখ্যাত বিখ্যাত লেখক থাকতে কার উপন্যাস নিয়ে উনি সিনেমা বানালেন- এ জাতীয়। এরপর থেকে পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা আমার কাছ থেকে গল্প উপন্যাস চাইতে আরম্ভ করল। এবং আমি হয়ে গেলাম একজন গদ্য লেখক।

প্রিবাং. ঃ দেশ পত্রিকার সাথে আপনার সম্পৃক্ততা ওখান থেকেই হলো?
সু. গ. ঃ ঠিক ওভাবে না। দেশে আসার পর ছয় বছর Freelance হিসেবে লিখতে লাগলাম। আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দেখল, এই ছেলে তো লিখেই অনেক পয়সা নিচ্ছে। তার চেয়ে ওকে এখানে একটা চাকরি দেয়াই ভাল। পরে আমাকে ৭০ সালে ডেকে চাকরি নিতে বলল। বেশ কিছুদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় থাকার পর ওরা আমাকে *দেশ* পত্রিকায় পাঠিয়ে দেয়। সে সময় সাগরময় ঘোষ ছিলেন *দেশ* পত্রিকার সম্পাদক।

প্রিবাং. ঃ আমাদের আজকের যে বাংলা সাহিত্য, নিঃসন্দেহে এটা আদি বাংলা সাহিত্যের বিবর্তিত রূপ। এতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব কতটুকু আছে? বাংলায় পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বা একের সাথে অন্যের সম্মিলনকে আপনি কি চোখে দেখেন?
সু. গ. ঃ আমাদের বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমা সাহিত্যের প্রভাব সবসময়ই পড়েছে, সেটা যত গৌণই হোক না কেন। এতে কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় নি। সাহিত্যে সবসময় গ্রহণ-বর্জন চালু থাকে। শুধুমাত্র নিজেদের প্রাচীন ধারণা আকড়ে থাকলে কোনো উন্নতি হয় না। আমাদের সাহিত্যে রোমান্টিসিজম এসেছে পাশ্চাত্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলেছেন, দুই ইংরেজের সাথে এক ইংরেজ আমাদের শাসন করতে গিয়ে শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে। আরেক ইংরেজ আমাদের সাহিত্য দিয়েছে। মুক্তচিন্তা করতে শিখিয়েছে।

প্রিবাং. ঃ সময়ের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্য একেকটি ধাপ অতিক্রম করেছে। বিশ শতকের এই কম্পিউটারের যুগে, ইন্টারনেটের গতিময় জীবনে পাঠকের সংখ্যা কমেছে কি?
সু. গ. ঃ যুগের হাওয়া বলে একটা কথা তো আছেই। কিন্তু আমার মনে হয় বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে এখনও ওভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব বিশাল আকারে পড়ে নি। কোলকাতার কথাই ধরো। আমাদের দেশে আর কয়টা ঘরেই বা কম্পিউটার আছে? আমাদের যুব সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, বাইরে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সম্পর্ক ছেদ করা- এটা কিন্তু সেভাবে হয় নি। কোলকাতার বইমেলায় এত লোক সমাগম হয়! দুই বাংলাতেই তরুণ লেখকদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। পাঠকও প্রচুর।

প্রিবাং. ঃ বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সাহিত্যের ভাষা আর মৌখিক ভাষার যে মিল আর অমিল আছে, তা বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে কি?
সু. গ. ঃ আমাদের বাংলাভাষার মধ্যে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা থাকলেও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে আমর গ্রহণ করেছি কৃষ্ণনগরের ভাষাকে। প্রমথ চৌধুরী, পরে রবীন্দ্রনাথ ওই ভাষাতে লিখতে শুরু করেন। পরে যখন বাংলাদেশ হয়, তখন প্রশ্ন উঠেছিল এতগুলো জেলার মধ্যে কোন জেলার ভাষাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। তখন ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঠিক করেছিলেন কৃষ্ণনগরের ভাষা, যেটা পশ্চিমবাংলায় ব্যবহৃত হয়, আগে সারা বাংলায় ব্যবহার হতো, সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সেটাকেই গ্রহণ করা হবে। সেজন্য বাংলাদেশে রেডিও, টেলিভিশনে, গল্প-উপন্যাসে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, পশ্চিমবংলাতেও সেই একই ভাষা। মৌখিক ভাষায়, কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণে কিছুটা তফাৎ থাকতে পারে। কিন্তু মূল ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রিবাং. ঃ তবু একথা সত্য যে বাংলাদেশ আর কোলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কিছু তফাৎ রয়েছে। এটার কারণ কি বলে আপনার মনে হয়?
সু. গ. ঃ আসলে দুই বাংলার সাহিত্যের মাঝে খুব একটা বড় তফাৎ নেই। লেখনী, ভাষায় মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। যেটুকু পার্থক্য হয়েছে, সেটা হলো দূরত্বের কারণে। যদি মেলামেশাটা আরো সহজ হয়, যদি পাসপোর্টের কড়াকড়িটা আরও একটু শিথিল হয়, তাহলে দুই বাংলার মধ্যে যে সামান্য সাংস্কৃতিক ভিন্নতা আছে, সেটাও কাটিয়ে উঠা যাবে।

প্রিবাং. ঃ কখনও কি আপনার মনে হয়, যদি দুটো বাংলা এক হতো!
সু. গ. ঃ দুই বাংলা এক হবার মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। যদি দুই বাংলা এক হতো তাহলে গণ্ডগোল, মারামারি কাটাকাটি আরো বেশি হতো। ভবিষ্যতে হবে কিনা, জানি না। তবে আপতত এখন এমন কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। আর আমার মতে এখন না হওয়াই ভাল। পাশাপাশি যদি আমরা শান্তিতে থাকি, যাওয়া-আসা যদি সহজ হয়, পারস্পরিক ভাব বিনিময় সহজ হয়- সেটাই ভাল হবে সকলের জন্য।

প্রিবাং. ঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রাতারাতি কোন পরিবর্তন এসেছিল কি?
সু. গ. ঃ স্বাধীনতার পর আমাদের যুব সমাজের মাঝে ভীষণ নৈরাশ্য আসে। স্বাধীনতার আগে সবাই ভেবেছিল যে দেশটা বদলে যাবে, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে তফাৎ ঘুচে যাবে, মানুষ না খেয়ে থাকবে না, হিংসা-হানাহানি থাকবে না। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেল স্বপ্ন অসত্য হলো। বাংলাদেশ হবার আগে পাকিস্তান বিভক্ত হলো ধর্মের ভিত্তিতে। দেখা গেল একই গ্রামের মানুষ হয়ে একদল আরেক দলকে শোষণ করছে। আর ভাষার প্রশ্ন তো ছিলই। ভাষা নিয়েই বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। অসন্তোষ থেকে বিপ্লব, বিপ্লব থেকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ থেকে দেশ ভাগ, স্বাধীনতা। পশ্চিমবাংলাতেও নানা বিক্ষোভ হয়েছে। যেমন নকশালরা মনে করেছিল বন্দুকের সাহায্যে বিপ্লব করে সরকার বদল করতে পারলে মানুষে মানুষে বৈষম্য মিটে যাবে। তারা সফল হয় নি ঠিক, কিন্তু তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সাহিত্য তো দেশ, মানুষ আর সমাজের কথাই বলে। সময়ের সাথে দেশের পরিবর্তন হয়েছে যেমন, তেমনি তার প্রভাব পড়েছে আমাদের চিন্তা-চেতনায়, আমাদের সাহিত্যে।

প্রিবাং. ঃ গল্প, কবিতা, উপন্যাসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিষয়ে কিছুদিন আগে ভি. এস. নাইপল মন্তব্য করেছেন, Novel is dead। উপন্যাসে লেখা হয় না। উনার এই মন্তব্যকে আপনি

সাক্ষাতকার

কিভাবে দেখেন?

সু. গ. ঃ উনি যেটা বলেছেন যে উপন্যাসে লেখা হয় না, সেটা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। তিনি নিজে আর উপন্যাস লিখবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এধরনের মন্তব্য করেছেন। উনার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার কিছু নেই। কারণ উপন্যাস থাকবে। মানুষের জীবন চিত্র তো উপন্যাসেই ফুটে ওঠে। সাধারণ পাঠকরা তো উপন্যাসই বেশি পড়ে। যেমন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকদের প্রিয় একজন লেখক বা সাহিত্যিকের নাম বলতে বললে বেশির ভাগই হুমায়ুন আহমেদের কথা বলবে। হুমায়ুন আহমেদের এই জনপ্রিয়তা কিন্তু উপন্যাস লিখেই।

প্রিবাং. ঃ আপনি ব্যক্তিগতভাবে হুমায়ুন আহমেদের লেখা কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

সু. গ. ঃ হুমায়ুন আহমেদ বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। ওঁর লেখা পড়ে পাঠক একটা নির্মল আনন্দ পায়। ওঁর লেখা তো আমাদের *দেশ* পত্রিকায় প্রতিবছর ছাপা হয়, তবে তিনি বাংলাদেশে যেভাবে জনপ্রিয়, পশ্চিমবাংলায় ওভাবে নন।

প্রিবাং. ঃ আপনি তো বাংলাদেশে প্রায়ই যান। ওখানে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে কোনো বিরোধ কি আপনার চোখে পড়েছে?

সু. গ. ঃ হ্যা, চোখে তো পড়েই। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা তেমন একটা ভাল নয়। এখনও তারা নিরাপদ বোধ করে না। এর অনেকগুলো কারণ আছে। কিছু স্বার্থান্বেষী লোক ধর্মকে উস্কে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে। ধর্মের মধ্যে তো হিংস্রতা নেই- ধর্ম হলো শান্তির ব্যাপার। কিন্তু কিছু লোক রাজনৈতিক, আর্থিক স্বার্থে ধর্মের নামে উস্কানি দেয়, অন্যের ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রচার করে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু মুসলমানদের প্রতি সেরকম কোনো খারাপ ব্যবহার করা হয় না। ভারতের অন্যান্য জায়গাতে অবশ্য হয়। ওখানে এই একই ব্যাপার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই একটা ব্যাপারে গর্ববোধ করতে পারে যে সেখানে বহুকাল কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় না। আর হবার উপক্রম হলেও আমাদের সরকার সেটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে মোকাবেলা করেন।

প্রিবাং. ঃ বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন হলো মৌলবাদীদের প্রভাব বেড়েছে। ২০০৪ সালে বই মেলায় হুমায়ুন আজাদকে কুপিয়ে জখম করা হলো, পরে উনি মারা গেলেন। এর আগে কবি শামসুর রাহমানের ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয়। সৌভাগ্য যে কিছু হয় নি। মৌলবাদীদের এই আগ্রাসন সাহিত্যিকদের ওপর কেন?

সু. গ. ঃ এরকম হচ্ছে কারণ সাহিত্যিকরা অনেক সময় মুক্তচিন্তা প্রচার করে, যেটা মৌলবাদীদের ভিত দুর্বল করে দেয়। মৌলবাদী মানে তো এটাই যে তারা একটা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকে, সেখানে আর কোনো বিশ্বাস বা চিন্তার অবস্থান নেই। আর সেজন্যই তারা মুক্তচিন্তার কর্ণধারদের আক্রমণ করে। কারণ কলমের শক্তি ছাড়া সাহিত্যিকদের আর কোনো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো শক্তি নেই।

প্রিবাং. ঃ তসলিমা নাসরিন তার চিন্তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন কবিতার মাধ্যমে। এরপর তো কলাম, আত্মজীবনী লিখে পুরুষশাসিত সমাজের বীভৎস চিত্র উন্মোচন করলেন। অথচ সরকার তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করল। এ-বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

সু. গ. ঃ তসলিমা নাসরিনকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। ওর আত্মজীবনী *আমার মেয়েবেলা* সবচেয়ে বেশি বিতর্কের জন্ম দেয়। ওর বক্তব্যগুলো আমাদের পুরুষশাসিত সমাজ মেনে নিতে পারে নি। ও ধর্মের সমালোচনা করেছে। যেটার কারণে ওর জীবনের উপর পর্যন্ত হুমকি এসেছে। আমি কখনই এসবের পক্ষপাতি নই। সবারই নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত। মানুষ ধর্মের সমালোচনা করতেই পারে। এটা তার অধিকার।

প্রিবাং. ঃ দুই বাংলার বাঙালিদের মধ্যে কারা বাঙালি সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখবে বলে মনে হয় আপনার?

সু. গ. ঃ পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের তুলনায় বাংলাদেশিরা বেশি এগিয়ে এক্ষেত্রে। তারা ভাষার জন্য লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে। আর সারাবিশ্ব তো বাঙালিকে, বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশের জন্যই বেশি চেনে। দুঃখের ব্যাপার, পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত বাঙালি বিদেশে আসে, ভাষার জন্য তারা কিছু করে না। প্রবাসী বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা চুটিয়ে বাংলা বলে। পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা তাও বলে না। তারা বাংলা কথা বলতেই শেখে না। বাংলাদেশের পরিবারের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচলন অনেক বেশি। তারা বাঙালিত্ব সহজে ত্যাগ করে না।

প্রিবাং. ঃ প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি ছেলেমেয়েরা নিজ ও পশ্চিমা সংস্কৃতির যে দোটানায় পড়ে- এ পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধরে রাখা কি কষ্টসাধ্য নয়?

সু. গ. ঃ একটা ব্যাপার কি, ইংরেজি ভাষা কিন্তু সবাইকে শিখতে হবে। ওটা না শিখে উপায় নেই। আর পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ তো অনেক দিন ধরেই ঘটছে। দুটো তো একসঙ্গেও চর্চা করা যায়। আমার বাংলা গান যেমন শুনতে ভাল লাগে, তেমনি আমি ইংরেজি গানও ভালবাসি। বাংলা বলতে পারি, ইংরেজিতেও কথা বলতে পারি। এটা তো অসম্ভব না। মূল কথা হলো, নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখার ইচ্ছে। চাইলে, ইচ্ছেটা থাকলে শেখা, সংস্কৃতিটাকে টিকিয়ে রাখা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

প্রিবাং. ঃ আপনি তো বিভিন্ন সম্মেলনে, নিমন্ত্রণে প্রবাসে আসেন। আমেরিকা ঘুরে যান। প্রবাসী বাঙালিদের কেমন লাগে?

সু. গ. ঃ এবার তো এলাম শিকাগোর বঙ্গমেলা আর ভ্যাঙ্কুভারে বঙ্গোৎসব থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে। বঙ্গমেলাটা খুবই আন্তরিক ছিল। আর নিউ ইয়র্কে যে বঙ্গ সম্মেলন হলো, ওটা এত বড়ো হয়েছে, অবিশ্বাস্য! হাজার হাজার মানুষ এসেছিল। অথচ খুবই আন্তরিক। প্রবাসী বাঙালিরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। প্রবাসে এধরনের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। প্রবাসী বাঙালিরা দেশের কবি সাহিত্যিকদের খাতির, যত্নের জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে। সঞ্জীবচন্দ্র লিখে গেছেন যে প্রবাসে সব বাঙালিই ভাল, দেশে যত ঝগড়াই থাকুক না কেন, ওখানে খুব ভাব। কথাটা বোধ হয় সত্যি। তবে প্রবাসী বাঙালিরা অনেক আন্তরিক একথা অস্বীকার করা যাবে না।

প্রিবাং. ঃ আপনার ভ্রমণ কাহিনী ছবির দেশে কবিতার দেশে **তে Iowa-এর কথা এসেছে। তখনকার সেই ছবির দেশের সাথে আজকের মিল খুঁজে পান?**

সু. গ. ঃ নাহ্, সবকিছু বদলে গেছে। সেই ৬৩ সালের Iowa-এর সাথে এখনকার Iowa-এর অনেক পার্থক্য। এবার ওখানে গিয়ে দেখি রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, দোকানপাট সবকিছু বদলে গেছে। আমার বাড়ির পাশে রেল স্টেশন ছিল। ওটা পর্যন্ত উঠে গেছে। জিনিসপত্রের দাম পর্যন্ত ছয় থেকে সাতগুণ বেড়ে গেছে। অনেক পার্থক্য।

প্রিবাং. ঃ এক কথায় বাঙালির দোষ আর গুণ বলবেন কি?

সু. গ. ঃ বাঙালির দোষ হলো তাদের মধ্যে কোনো একতা নেই। প্রবাসে বলো, দেশেই বলো সবখানেই একই ব্যাপার। আর বাঙালির একটা বড় গুণ হলো তারা সাহিত্যিকদের যেরকম খাতির করে, অন্য কোনো জাতি তা করে না। আমি ক'দিন আগে আমেরিকায় একটা সরকারি সফরে এসেছিলাম সাথে বেশ ক'জন ভারতীয় লেখক গিয়েছিল। আমরা বিভিন্ন শহরে গিয়েছিলাম। তো আমি যেখানেই গিয়েছি, আমাকে অন্য বাঙালিরা ধরে নিয়ে গেছে। বলেছে, আপনাকে হোটেলে থাকতে হবে না, আমাদের বাড়ি চলুন। অথচ আমার সাথে আরো ছিল তামিল, গুজরাটি, হিন্দি লেখক- তাদেরকে কেউ খাতির করে ডেকে নিয়ে যায় নি। বাঙালিদের এই আন্তরিকতা, আতিথেয়তা সত্যিই অসাধারণ।

প্রিবাং. ঃ আপনি তো অনেক দেশে ভ্রমণ করেছেন, অনেক রকম মানুষ দেখেছেন। কোনো জাতির সঙ্গে বাঙালির মিল খুঁজে পেয়েছেন?

সু. গ. ঃ আসলে যত মানুষই তুমি দেখ না কেন, সব মানুষই কিন্তু ভেতরে এক। গায়ের রং, ভাষা তফাৎ হলেও প্রেম, ভালবাসা সবই এক রকম।

প্রিবাং. ঃ আপনার কবিতায় নীরা চরিত্রের কথা বার বার এসেছে। নীরা চরিত্রের রহস্যটা প্রিয়বাংলা-**এর পাঠকদের জানাবেন?**

সু. গ. ঃ এই প্রশ্নটা আমাকে এত শুনতে হয়! এটার একটাই উত্তর, যারা কবিতাগুলো পড়ে যেটুকু বুঝতে পারবে না, নীরার রহস্য ততটুকুই। এর বাইরে কিছু না।

প্রিবাং. ঃ আপনার মূল্যবান সময়ের খানিকটা ***প্রিয়বাংলা*কে দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।**

সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করার সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিউ ইয়র্কে অবস্থান করছিলেন।